

তপন সিংহ (১৯২৪-২০০৯)

তপন সিংহের জন্ম কলকাতায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যা নিয়ে পাশ করে তাঁর চলচ্চিত্র জীবন শুরু করেন ১৯৪৬ সালে— নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। ১৯৫০-এ লন্ডন ফিল্ম ফেস্টিভাল থেকে আমন্ত্রণ পান পাইনউড স্টুডিওতে কাজ করার। বিলেতে বছর দুই থেকে কলকাতায় ফিরে তিনি চলচ্চিত্র পরিচালনায় উৎসাহী হন। হলিউড-এর ছবির প্রভাব তাঁর ওপর প্রথম থেকেই বর্তমান ছিল। প্রথম ছবি অঙ্কুশ (১৯৫৪)-এই তপন সিংহ নজরে আসেন চলচ্চিত্রপ্রেমীদের, যদিও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আসে ১৯৫৭ সালে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে *কাবুলিওয়াল্লা* ছবির জন্য। বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত তপন সিংহ 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কার পান ২০০৬ সালে। ১৫ই জানুয়ারি ২০০৯-এ তপন সিংহ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তপন সিংহের উল্লেখযোগ্য কিছু ছবি —

কাবুলিওয়াল্লা (১৯৫৭), *লৌহকপাট* (১৯৫৮), *ক্ষণিকের অতিথি* (১৯৫৯), *ঝিন্ডের বন্দী* (১৯৬১), *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* (১৯৬২), *নির্জন সৈকতে* (১৯৬৩), *জতুগৃহ* (১৯৬৪), *গল্প হলেও সত্যি* (১৯৬৬), *হাটেবাজারে* (১৯৬৭), *সাগিনা মাহাতো* (১৯৭০), *বাঞ্ছারামের বাগান* (১৯৮০), *আতঙ্ক* (১৯৮৬), *এক ডক্টর কি মৌত* (১৯৯১), *হইল চেয়ার* (১৯৯৪)।

প্রসঙ্গ তপন সিংহ: শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

সাক্ষাৎকার

- প্র তপন সিংহ যখন প্রথম ছবি অক্ষুশ করছেন তখন ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি মুভমেন্ট চলছে। অথচ যেটার সাথে কোনো যোগাযোগ নেই তপনবাবুর, আপনার কী মনে হয়?
- উ আমি মোটামুটি '৫৫ সাল থেকেই শুরু করছি, যে সময় দুটো চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে— একটা '৫৪ সালে রক্তকরবী বহুরূপীর, আর '৫৫ সালে পথের পাঁচালী। আমরা তখন কলেজ শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছছি; আর তখন আমাদের এই প্রভাবগুলো চমকপ্রদ। তখন জীবনানন্দ প্রচণ্ড জীবন্ত, মানে উনি মারা যাবার পরেই ওঁর বড়ো প্রভাবটা ছড়াতে থাকে। তখন আমার মনে আছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের দশমী বের হচ্ছে এবং সিগনেট প্রেস থেকে কিনে আমরা দু-বন্ধু দু-জনে দুজনকে সেই বই উপহার দিচ্ছি। অর্থাৎ এই রকম একটা আবহ তৈরি হচ্ছে। সেখানে কিন্তু আমাদের কাছে তথাকথিত যে ব্যবসায়িক সিনেমা বা ব্যবসায়িক থিয়েটার, দুটোই প্রায় অস্পৃশ্য। এটা আমাদের মনোভাব, এবং এটাকে এই জন্যই আমি তার সময়, কাল, ইতিহাসের মধ্যে ফেলছি, এটা ভুল কি ঠিক সে কথায় পরে আসব। তখনই প্রথম প্রেমেন্দ্র মিত্র সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পাচ্ছেন, আমরা জীবনানন্দের নতুন সাহিত্য পাচ্ছি, আমরা এই ঘটনাগুলোর মধ্যে দিয়ে আসছি যেখানে পুরোনো বাঙলা সিনেমা ও বাংলা থিয়েটার দুটোকেই প্রায় বর্জন করছি। থিয়েটারের ক্ষেত্রে আরো একটা ব্যাপার ঘটে যে '৫৫

সালেই শ্রীরঙ্গম বন্ধ হয়ে যায়, শিশিরবাবু সেখান থেকে বিতাড়িত হন। আমার মনে আছে কলেজে প্রথম বর্ষে থাকাকালীন যখন ঘোষণা হয়ে গেছে যে শ্রীরঙ্গম বন্ধ হচ্ছে এবং আমরা যেটুকু শুনেছি বা জানি যে শিশিরবাবু ওই থিয়েটারটাকে ভেঙে অন্য একটা পথ দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর এই প্রকল্পটা শেষ হয়ে গেল, ধ্বস্ত হয়ে গেল, উনি শ্রীরঙ্গম থেকে বিতাড়িত হলেন। সেটারও আমি কোথাও সাথী থাকতে চেয়েছি। ওই শ্রীরঙ্গমে মাইকেল মধুসূদন করছেন একেবারে মাসখানেক আগে, আমি গিয়ে দেখেছি।

অর্থাৎ এইরকম একটা সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, তখন কতকগুলো আবেগ আসে, ঠাণ্ডা মাথায় ইতিহাসবোধ আসে না। সেইখান থেকে যখন আমরা এগুলো দেখতে পাচ্ছি এবং তারপর সত্যজিৎবাবু আসছেন বা *পথের পাঁচালী*, তার সাথে সাথেই মুগালবাবু এবং ঋত্বিকবাবু এসে পড়ছেন। সেটা প্রায় ষাট-এর দশকের শুরু তখন তপন বাবুর মতো পরিচালকেরা আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যান, মুছে যান।

তারপরে আমরা ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি-র সাথে জড়িত হচ্ছি। বিদেশি ছবি। পঞ্চাশের দশকের শেষ বা ষাটের দশকের শুরুতে আমরা কলকাতায় প্রথম বার্গমান দেখতে পাচ্ছি, আস্তনিওনি, আকিরা কুরোসাওয়া দেখছি। এগুলো দেখার উত্তেজনা, প্রথম আবিষ্কারের উত্তেজনা, সবকিছু এই ৫৫ থেকে ৬৫-র মধ্যে, তাতে তপনবাবু আমাদের কাছ থেকে কোথাও আসেন না। তখন আমরা এটার মধ্যে এমনভাবে মজে যাই, জড়িয়ে যাই; তর্ক-বিতর্ক হয়, যেটা আর পরে সেভাবে হয়নি, এক একটা ছবিকে ধরে ধরে। আমার মনে আছে মুগালবাবু-র *কলকাতা* '৭১ বেরোচ্ছে, আমরা ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটিতে একটা দীর্ঘ তর্ক আয়োজন করেছি, আমি পক্ষে, নিত্যপ্রিয় ঘোষ বিপক্ষে, ঘর ভর্তি লোকের মধ্যে। এই বাতাবরণে স্বভাবতই একটা অন্য সিনেমা এবং অন্য সিনেমার একটা সম্ভাবনার প্রতি আমাদের একটা কমিটমেন্ট তৈরি হচ্ছে। বিশ্বাস



জন্মাচ্ছে, যে আমাদের একটা দায় আছে, কারণ, এ ছবিগুলো আপনা আপনি চলে আসবে না। ব্যবসায়িক শিল্পের বিপুল বৈভব, বিপুল ক্ষমতা, মিডিয়ার ওপর তার দখল, এখনকার মতো এত সর্বব্যাপী না হলেও যথেষ্ট প্রকট। তাহলে তার বিরুদ্ধে যদি এই নতুন সিনেমাকে দাঁড় করাতে হয়, তাহলে আমাদের যারা এই ছবিতে বিশ্বাস করি, যারা এই ছবি ভালোবাসে, আমাদের একটা পথ বেছে নিতে হয়। অর্থাৎ আমরা পার্টিজান হই, কারণ, যদি আমরা সবই ভালো ধরে নিই বা পুরোপুরি অবজেকটিভ হই, তাহলে এই যে লড়াইএর সময় এসেছে সেই লড়াইটা লড়া যাবে না।

তার ফলে কোথাও আমি বলব যে সম্পূর্ণ সচেতনভাবে না হলেও খানিকটা সচেতন খানিকটা অর্ধচেতনে আমরা তপনবাবুকে প্রত্যাখ্যান করেছি বা বর্জন করেছি।

- প্র মানে আজকের প্রেক্ষিতে বলছেন, না তখনকার প্রেক্ষিতে নিজেকে ফেলে বলছেন যে তপনবাবুকে বর্জন করেছিলেন ?
- উ আমি তো বললাম, সেই কারনেই তো বললাম যে খানিকটা সচেতন, খানিকটা অর্ধসচেতন। এটা যে পুরোপুরি একটা সিদ্ধান্ত করে আমরা ওঁকে বর্জন করছি তা নয়। কিন্তু সত্যজিৎ, ঋত্বিক, মৃগাল একটা পক্ষ, তপন সিংহ-রা আরেকটা পক্ষ, এই বিভাজন একটা কিন্তু তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা একটা পক্ষ বেছে নিই। কিন্তু কাউকে বেছে বর্জন করাটা হচ্ছে না। সেই জন্যই আমি ভেবে বললাম যে খানিকটা সচেতন, খানিকটা অর্ধচেতনে ওই বাতাবরণের মধ্যে আমরা ওঁকে বর্জন করি।
- প্র মানে তখন আপনারা যাঁদের নিচ্ছেন সেটা সচেতনভাবে করছেন কিন্তু যাঁদের বাদ দিচ্ছেন সেটা সচেতনভাবে নয় ?
- উ ওই প্রক্রিয়ার মধ্যে অনেকে বাদ পড়ে যাচ্ছেন তখন। এখানে আরেকটু বলি স্পষ্ট করে যে, এই সময় ছবির ধারা কিন্তু ডাইলিউটেড হয়ে যাচ্ছে। আর ব্যবসায়িক ছবি পুরো



দাপটে একটা বিরাট চেহারা নিয়ে জায়গাটা আবার দখল করে নিচ্ছে। যেটুকু জায়গার মধ্যে এই নতুনেরা ঢুকতে পেরেছিলেন, সে জায়গাটা সম্পূর্ণ বেদখল হয়ে যাচ্ছে। ব্যবসায়িক সিনেমা তারকাপ্রথার সুযোগ খাটাতে শুরু করেছে তখন।

প্র মানে সত্তরের মাঝামাঝি সময়?

উ সত্তরের মাঝামাঝি সময়, এবং এই সময়টাতেই কিন্তু ক্যালকাটা ফিল্ম-সোসাইটি ও ভাঙতে শুরু করেছে। আজ যখন আমরা ফিরে তাকাচ্ছি কেন আমরা পারলাম না, তখন শুধু পরিচালকেরা আপোশ করে পালিয়ে গেছেন এটা বলবার অধিকার আমাদের নেই। আমি অন্তত যেটা মনে করি। যে আমাদের পরিপূর্ণ দায়, আমরা পূরণ করতে পারিনি। এগুলো যখন আমরা ১৯৭৫-৮৫ সালে ভাবতে শুরু করেছি, তখন অনেকগুলো ক্ষেত্রেই পুনর্বিবেচনা হচ্ছে। মানে রাজনীতির ক্ষেত্রেও... এই সময়টাতে আমরা আবার আস্তে আস্তে ফিরে তাকাতে থাকি একটা পুনর্বিবেচনার গরজে। তখনই আমরা নতুন করে আবিষ্কার করি যে পঞ্চাশের দশকে শুধু তপনবাবুই নন, তাঁর পাশাপাশি, আরেক অর্থে একটা সমান্তরাল বাংলা ছবির ধারা কিন্তু তৈরি হয়েছিল। যেটা আমি আমার লেখাতে বলেওছি, এবং দুর্ভাগ্য আমাদের, যে এতে যাঁরা পুরোভাগে ছিলেন, তপনবাবু ছাড়া প্রায় প্রত্যেকেই বাংলা ছেড়ে বাইরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

প্রথম ঘটনা, নিমাই ঘোষ *ছিন্নমূল* করেই মাদ্রাজ চলে যান। তারপরে হেমেন গুপ্ত, যাঁর *ভুলি নাই* স্বাধীনতার ঠিক পরেই এবং এত কম সময়ের ব্যবধানে স্বাধীনতা আন্দোলনকে তুলে ধরে ছবিতে। তার কাছাকাছিই বিমল রায়ের বাংলা ছবি *উদয়ের পথে*-র পরে *অঞ্জনগড়* সুবোধ ঘোষের *ফসিল* থেকে। সমকালীন তথা আধুনিক বাংলা সাহিত্য এই প্রথম লক্ষণীয়ভাবে বাংলা ছবিতে স্বমর্যাদায় স্থান পাচ্ছে। অসিত সেন, সত্যেন বসু, অজয় কর, অগ্রগামী প্রমুখের ছবিতে উঠে আসছিল নতুন অনেকগুলো বিষয়-কাছাকাছি সময়ের ইতিহাস, স্বাধীনতা আন্দোলন, স্বাধীনতার স্পৃহা, কমেডি,

S
I
L
H
O
U
E
T
T
E



শিশু-কিশোর-জগৎ আধুনিক সাহিত্য, আধুনিকতম সাহিত্য; নিমাই ঘোষের *ছিন্নমূল*-এ দেশভাগ, এবং ওই রকমভাবে শিয়ালদহ প্ল্যাটফর্মে সরাসরি ছবি তোলা, ডকুমেন্টেশন, এবং তার সঙ্গে ফিক্শন-কে মেলানো। এই কাজ তখনকার দিনে অভাবনীয়, অর্থাৎ বড়ো বড়ো কয়েকটা পদক্ষেপ কিন্তু হচ্ছে। এই সময় কিন্তু আমরা নেই। এগুলো '৫৫-র আগে ঘটে যাচ্ছে। আমরা দেখিনি সেটা। পরে আমরা এগুলো দেখেছি, তখন এগুলো অনেকপরে আবার দেখানো হয়েছে। যখন আর্কাইভ সক্রিয় হয়েছে তখন এগুলো আবার দেখতে পাচ্ছি। তাই ওইটাকে অস্বীকার করার বা না চেনার দায় আমার প্রজন্ম, আমরা, পুরোপুরি গ্রহণ করব না। আমরা দেখিনি। আমাদের দেখাটাই শুরু হচ্ছে *পথের পাঁচালী* থেকে, তারপর মৃগালবাবু বা ঋত্বিকবাবুর ছবি থেকে। যেখানে কিন্তু তপনবাবুকে আমরা নিতে পারছি না। এই প্রবণতাগুলো আমরা কিন্তু দেখিনি, একটা যে সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছিল যার সঙ্গে তপনবাবুর *অক্লুশ* কিন্তু যুক্ত, তা আমরা তখন দেখিনি। আমরা আবার যখন এই ছবিগুলো ফিরে দেখার সুযোগ পাচ্ছি — তখন ওই ধাক্কাটা আমরা খেয়েছি, তখন আমাদের এই বিশ্বাস, আমাদের এই আশাবাদ, এই আবেগ একটা প্রচণ্ড মার খেয়েছে, তখন আমরা এটাকে historicize করছি। তখন historically দেখার চেষ্টা করছি এবং তখন মনে হচ্ছে যে যেটা পরে মধ্যবর্তী সিনেমা বা middle of the road cinema ইত্যাদি formulated হবার আগেও কিন্তু এই বোধগুলো এই ভাবনাগুলো আমাদের মধ্যে আসতে শুরু করছে যে তাহলে কি ওখান থেকেই আরেকটা ধারা আসতে পারত? আমরা হয়তো খানিকটা দায় এড়াতে পারি, কিন্তু থাক, যদি বলি যে আমাদেরই দায় ছিল— যদি ওই সমর্থনটা আমরা দিতে পারতাম যেটা আমরা সত্যজিৎবাবু বা মৃগালবাবু বা ঋত্বিকবাবু কে দিয়েছি তাহলে হয়তো ওই ধারাটা এগোতে পারত। কিন্তু ওই ধারাটা মুছে গেল, তপনবাবুই একমাত্র লেগে থাকলেন, রয়ে গেলেন, আর বাকি সকলেই চলে গেলেন। মানে ওঁর সমকালীন



যাঁরা এই নতুন পথ গুলো দেখাচ্ছিলেন তাঁরা সবাই চলে গেলেন। তাঁরা কিন্তু গিয়ে বসেতে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। নিজের সিদ্ধান্তেই উনি এখানে রয়ে গেলেন এবং বোধহয় ওইজন্যে ওঁকে একটু বেশি দাম দিতে হল। মানে যে স্বীকৃতিটা ওঁরা পেয়ে গেলেন যে কাজের জায়গাটা ওঁরা পেলেন... উনি কিন্তু অনেক আগে দিলীপকুমার কে নিয়ে ওখানে কাজ করতে পারতেন, যেমন পেরেছিলেন বিমল রায়।

প্র ওনার ছবির কথায় যদি আসি তাহলে উনি বারবার হলিউডের কথা বলছেন, সত্যজিৎ রায় থেকে শুরু করে তখন যখন সবাই নিও-রিয়ালিজম দ্বারা প্রভাবিত তখন ওনার এই বোধটা কি উনি ওখানে কাজ করেছিলেন বলে? নাকি অন্য কোনো কারণ?

উ না, উনি কিন্তু হলিউডে কাজ করেননি। আমি ওঁর লেখার সংকলন সম্পাদনা করতে গিয়ে আরো জানতে পারলাম, উনি কয়েকমাস লন্ডনের পাইনউড স্টুডিওতে একজন অবজার্ভারের কাজ করেন। কিন্তু একটা জিনিস ওঁকে প্রথম থেকেই স্পর্শ করেছিল কারণ উনি, মূলত সিনেমার একজন টেকনিক্যাল দিকের লোক; বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন, প্রথম কর্মক্ষেত্র রূপে সাউন্ড রেকর্ডিং বেছে নিয়েছিলেন, ক্যামেরাতেও গভীর আগ্রহ ও কৌতুহল ছিল এবং যেটা উনি বলেন যে, বিমল রায়ের অঞ্জনগড়-এর সময় উনি বিশেষভাবে রপ্ত করেন ক্যামেরার দৃষ্টি, ক্যামেরার পারস্পেক্টিভ, যেটা প্রচণ্ডভাবে বিমল রায়ের কাছ থেকে ওঁর পাওয়া। তখনই হলিউডের টেকনিক্যাল জায়গাটায় একজন টেকনিসিয়ান, একজন টেকনোলজিস্ট হিসেবে মনোনিবেশ করে তিনি তার মধ্যে এমন একটা সম্পদ দেখতে পান, এমন একটা প্রকাশক্ষমতা দেখতে পান যেটা অন্য অনেকে দেখবেন না। এবার আপনি যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে সত্যজিৎ রায়, মৃগাল সেন বা ঋত্বিক ঘটক তিনজনেই কিন্তু কারিগরির দিক থেকে বেশ দুর্বল। সত্যজিৎ রায় পার পেয়ে যান সুব্রত মিত্র আর বংশী চন্দ্রগুপ্ত-র জন্য। এই দুজনে চলে যাবার পর সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে যদি কারিগরির দিক বা ভিস্যুয়াল দিক দেখেন

S
I
L
H
O
U
E
T
T
E



তাহলে দেখবেন সেটা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত। সত্যজিৎ রায় যতই বলুন আমি ক্যামেরা করি আমি সব করি, কিন্তু যে কোনো দর্শক বুঝতে পারবে। আমরা দেখতে পাই *চার্লস*-য় যা আছে *শাখা-প্রশাখা*-য় নেই। একেবারে নেই— ঋত্বিকবাবুর ক্ষেত্রও তাই। মানে সম্পাদনা বা ক্যামেরাতে কখনো বা রামানন্দবাবু উত্রে দিয়েছেন কখনো দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায় উত্রে দিয়েছেন। মুণালবাবু বারবার ক্যামেরাম্যান পাল্টেছেন। সংগীত পরিচালক বদলেছেন, কারণ উনি ওগুলো করতে পারেন না। তপনবাবুর কিন্তু এই সুবিধেটা ছিল এবং হলিউডের technical strength ও গল্প বলার চমৎকারিত্বই তপনবাবুকে হলিউডের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। অথচ সর্বদাই তাঁর দৃষ্টি ছিল যাতে তাঁর ছবি বাঙালিই থাকে, তাঁর দর্শকদের wave length- এ বাজে। অন্য দিকে ইতালীয় নিওরিয়ালিজমের প্রথমদিকে সিনেমার কারিগরি দিকটাকে অবহেলা প্রায় মজ্জাগত ছিল। প্রবল মার্কিন বোমাবর্ষণে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তখন ইতালির প্রায় সমস্ত কিছুই নষ্ট হয়ে গেছে। তখন ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে শট নেওয়াটা কোনো শৌখিনতা নয়, বরং একমাত্র উপায়। এই অভাবটাকেই স্টাইল-এ পরিণত করে তার নন্দনতত্ত্ব রচনা করাতেই রোসেলিনি-ডিসিকা-র কৃতিত্ব।

সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক বা মুণাল সেন যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে আনাগোনা করতেন, যেখান থেকে গুঁদের ছবির ভাবনা নিয়ে আসতে পারতেন, সেই সুযোগটা বা সেই কালচারটা বা সেই intellectual training-টা তপনবাবু lack করেন কোথাও। তার ফলে তপনবাবু একটা সিদ্ধান্ত নেন—আমার মনে হয় যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত— যে উনি বাংলা সাহিত্যের ওপর নির্ভর করবেন কিন্তু যেভাবে শুধু আবেগ দিয়ে, অভিনয়ের ওপর ছেড়ে দিয়ে বাংলা ছবি হয়েছে, সেরকম না করে নিজের একটা technical discipline দিয়ে সেটাকে সংযত করবেন। মানে একটা form-এর বাঁধুনি হবে। কিন্তু উনি বার বার ফিরে যান সাহিত্যে, কারণ অন্য কোথাও থেকে



ওঁর কোনো রসদ নেবার নেই। আর তপনবাবুকে যতটা দেখেছি, ওঁর সম্পর্কে যতটা শুনেছি, মনে হয় উনি একটা খুব সীমিত গোষ্ঠীর বাইরে মিশতেন না, ততটা সামাজিক লোক নন। মুণাল বাবু যেভাবে এখানে আড্ডা মারেন, ওখানে আড্ডা মারেন, বা সত্যজিৎবাবু একটা সময় অবধি কফি হাউসে নিয়ম করে যাচ্ছেন। সমর সেন, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, কমলকুমার মজুমদার, নানারকম লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন, যে-সুযোগটা তপনবাবুর জীবনে কোথাও ওঁর ব্যক্তিগত চরিত্রে বা ব্যক্তিত্বে আসে না। তার ফলে ওঁকে সাহিত্যের ওপরেই নির্ভর করতে হয়। আর ওঁর ছবির চরিত্রটাও এখান থেকেই তৈরি হয়ে যায়। তার ফলে উনি যেমন মূলধারার বাংলা সাহিত্যের অন্তর্গত যে ধ্রুপদী সাহিত্য, তাকে তাঁর ছবিতে নিয়ে আসছেন, তেমনই হলিউডের টেকনিক্যাল যে কালচারটা সেটা নিয়ে আসছেন। আরেকটা যেটা খুব interesting ব্যাপার, প্রথম দিকে অনেক দিন পর্যন্ত— যেটা পরে উনি ভাঙবার চেষ্টা করেছেন— উনি সবসময় চিত্রসফল অভিনেতাদের নিয়েই কাজ করেছেন। পরে কিন্তু যখন ওখান থেকে বেরোচ্ছেন, যেটা আমরা ওঁর বইতে পড়ি, উনি রবি ঘোষকে আবিষ্কার করছেন বা *বিন্দের বন্দী*-র পর সৌমিত্রবাবুকে একটা দীর্ঘসময় কাজে লাগাননি বলে আপশোস করছেন।

আরেকটা জিনিস যেটা ওঁর আসে— সেটাও হলিউডেরই ধারায়— পরিচালক হিসেবে একটা সিস্টেম এর মধ্যে থেকেও নিজের terms dictate করা, যেজন্য উনি বারংবার জন ফোর্ড, উইলিয়াম ওয়াইলারের কথা বলেন। যে দুটো নাম ওঁর লেখায় বার বার ফিরে আসে। তাছাড়া হয়তো ফ্রেড জিনেম্যানের কথা বা স্পিলবার্গের কথাও বলেছেন, কিন্তু ওঁদের মতো করে নয়। তার আরেকটা কারণও আমি বলব, এঁদের humanist concern for society, যা ফোর্ড-এর ওয়েসটার্ন-এও এমন দীপ্ত— *স্টেজকোচ*-এ একজন আততায়ী যখন সদর্শক ভূমিকা নেয়, তখন তার মধ্য দিয়ে



প্রাতিষ্ঠানিক ন্যায়-অন্যায় বোধ বা বিচার ব্যবস্থা বিষয়ে অনেক প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হয় সমাজের প্রতি। উনি বোধহয় একটা লেখার মধ্যেও একজন পরিচালক হিসাবে ওঁর দায়বদ্ধতার কথায় বলেন যে তাঁকে কোনোদিন প্রযোজকের জন্য বসে থাকতে হয়নি। অর্থাৎ প্রযোজকেরা জানে, শ্রদ্ধা করে ভালোবাসে বলে নয় — তারা জানে তারা ওঁর ছবিতে টাকা লগ্নি করলে টাকা ফিরে আসবে। এইটা যখন উনি নিশ্চিত হয়েছেন তখন বিশেষ করে শেষের দিকে, তখন উনি এতরকম বিষয় নির্বাচন করছেন—এখানে আমি আবার ফোর্ড, ওয়াইলারের কথা বলব, যাঁদের সাথে তপনবাবু identify করেন *not with the Hollywood mainstream, but their departures*। যেটা থেকে শেষদিকের ছবিগুলোয়। এত রকমের বিষয়, এত প্রশ্ন তোলেন— *হইল চেয়ার, আতঙ্ক, গল্প হলেও সতি, আদমী আউর আওরৎ*— এত রকমের *departure*, কিন্তু *within the system* — ওই লক্ষ্য, ভালো করে গল্প বলব ভালো অভিনয় — শেষের দিকে কিন্তু বুঝছেন যে এবার অন্য অভিনেতাদের আনতে হবে। যখন কিন্তু এই জাতীয় ছবিগুলো, একটা *concern*- এর জায়গা থেকে ছবি, সমাজ সম্পর্কে চেতনা থেকে, দায়বোধ থেকে করা ছবি, এই সময়টাতে এসেই ফিল্ম সোসাইটির ধাক্কাটা খেয়ে আমরা তখনকার দিকে ফিরে তাকাই। যেমন দেখবেন যে ওই সময়টাতে ফিল্ম সোসাইটির পত্রপত্রিকাতেও তপনদার সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে। যেমন আশির দশকের শুরুতে আমরা ইংরাজীতে *Splice* বলে একটা পত্রিকা বার করি। এই পত্রিকার একেবারে শুরুতে আমরা আদমী ওর আওরৎ-এর চিত্রনাট্য ছাপি, মানে *film society circuit*-এ প্রথম, ওঁর চিত্রনাট্য ছাপা হচ্ছে যার সঙ্গে আমি ওকে ইন্টারভিউ করি। আমরা তখন আন্তরিক ভাবেই ওঁর জায়গাটায় দৃষ্টিপাত করছি, ওঁকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছি। এই সময়তেই ওই আশির দশকে আমরা ঐতিহাসিক ভাবেও তপনদাকে চিনতে বা স্বীকার করতে শুরু করেছি।



- প্র ওনার বামপন্থার বা মার্ক্সইজম-এর প্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থা কি নিওরিয়ালিজম কে সরিয়ে রাখার আরেকটা কারণ বলে আপনার মনে হয়?
- উ আমার মনে হয় না। একেবারেই মনে হয় না। যেটা আমার খুব দুঃখের ব্যাপার মনে হয়— এখনো আমি নিজেকে বামপন্থী সংস্কৃতির লোক বলেই বিবেচনা করি, কিন্তু তাও বলব, অনেকদিন পর্যন্ত এখানকার বামপন্থী সাংস্কৃতিক আন্দোলন সিনেমাকে তার স্বতন্ত্র জায়গা দেয়নি। কিন্তু তখনকার ক্ষেত্রে মার্ক্সিস্ট দর্শনকে বাদ দিচ্ছেন বলেই সেই দর্শনের যে tools সেগুলোকে reject করবেন, এটা কিন্তু কখনও আসেনি; যেমন ধরুন উনি *Battleship Potemkin* সম্বন্ধে খুবই উচ্ছ্বসিত, এবং তার মন্তাজ বা অন্যান্য ব্যাপারগুলো পরবর্তী ছবিতে কাজেও লাগাচ্ছেন।
- প্র আরেকটা লাইন আপনাকে যোগ করে দিই যে উনি ওনার বইতে একটা জায়গায় বলছেন যে এখন সারা বিশ্বে বামপন্থী পরিচালকেরা যে প্রভাব বিস্তার করেছে সেটাকে উনি সদর্থক ভাবে দেখছেন না। এই জায়গাটা একটু বলুন।
- উ কিন্তু পাশাপাশি এটাও ধরুন যে আরেকটা খুব বড়ো দার্শনিক জায়গা যেটা থাকে, সেটা হল ওঁর stand against violence, এটা খুব গভীর বিশ্বাসের জায়গা। Against violence এবং এটাকে আমরা মার্ক্সইজম-এর terms এ যদি বলি ‘Communitarian’ অর্থাৎ he believes in the community as an organic entity। একটা সমাজ তার মধ্যে সম্পর্কগুলো ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনি যদি মার্ক্সইজম-এর কথা, যখন মার্ক্স future এর কথা বলেন তখন কিন্তু এইটার কথাই বলেন— communitarian civilization। সেখানে ওঁর একটা আস্থা বা বিশ্বাসের জায়গা আছে, কিন্তু অবশ্যই Communist Party যেভাবে করে, যেভাবে পার্টিকে চালনা করে সেটাকে উনি সমর্থন করেন না। সেখানে predominance of violence, violence দিয়ে চট্ জলদি কোনো একটা সমাধানে পৌঁছে যাওয়া, সেটাকে উনি completely reject করেন। আর সেই



rejection-টা ওঁর বেশ strong একটা জায়গা বলে আমি মনে করি, তাঁর আদর্শ বা দর্শনের জায়গা থেকে।

প্র উনি *সাগিনা মাহাতো* বানাচ্ছেন সত্তর সালে দলতন্ত্রের বিরুদ্ধে, পার্টিতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সমর্থন করতে পেরেছিলেন? আপনার কী মতামত ছিল বা তৎকালীন সবাই-এর মতামতই বা কী ছিল?

উ একটা ব্যাপার যে কোথাওই আমার লেখার মধ্যে— আমাদের বললে মুশকিল হয়— আমার লেখার মধ্যে কিন্তু কখনো political considerations in that sense-কে আমার পক্ষে কে আমার বিপক্ষে— এইটা আমার কাছে কখনো matter করেনি। আমার কোনো সিনেমা নিয়ে লেখায় সেটা আসেনি, সাগিনা মাহাতো ছবি হিসাবে আমার সেরকম কোনো বড়ো মাপের ছবি বলে মনে হয়নি। অভিনয়ে, technical level-এ কিছু ভালো কাজ ছিল, এই মাত্র।

প্র আপনি তখনকার মতটা বলছেন না এখনকার?

উ না তখনকার মত— যে অভিনয়ের দিক থেকে, even কিছু technical দিক থেকে আমার interesting কাজ বলে মনে হচ্ছে, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। কিন্তু তখন *সাগিনা মাহাতো*-র সময় আমাদের মধ্যে ওই বোধটা কাজ করছে— যে আমরা film society-র terms-এ বা film language-এর terms-এ not in terms of left politics, আমরা তপনবাবুর বিপক্ষে, আমরা সত্যজিৎ, ঋত্বিক, মৃগালবাবুদের পক্ষে।

প্র তার মানে *সাগিনা মাহাতো* যেমন কারিগরি দিক থেকে আপনারা গ্রহণ করেছিলেন তেমনই বিষয়বস্তুর দিক থেকেও সেটা গ্রহণ করতে আপনাদের কোনো অসুবিধা হয়নি?

উ হ্যাঁ, কারণ একজন যদি তাঁর অভিজ্ঞতাকে এভাবে দেখাতে চান বা দেখান যে অভিজ্ঞতাটা আমার জানা নেই, কিন্তু আমি সাহিত্যে যখন পড়ছি, আমি অন্য জায়গাতে



যখন পড়ছি, তখন পার্টিকে খর্ব করা হল বা ওই ধরনের কোনো কিছু আমার মনে হচ্ছে না। That is not my reading. I treat it as a case, and as a warning। মনে রাখবেন, আমরা বিংশতি সোভিয়েত পার্টি কংগ্রেসের পরে পার্টিতে এসেছি, বামপন্থী সংস্কৃতিতে এসেছি।

প্র তপন সিংহের ছোটোদের ছবি নিয়ে কী বলবেন?

উ আমি খুব impressed হইনি। মানে *সফেদ হাতি* আমাকে খুবই disappoint করে। আমি বোধহয় *সফেদ হাতি* নিয়ে লিখেওছি। বা *সবুজ দ্বীপের রাজা* বা *আজ কা রবিনহুড*, যাই বলুন আমাকে কোনটাই impress করতে পারেনি।

প্র আপনাকে তপনবাবুর তিনটে ছবি বাছতে হলে, আপনি কোন ছবিগুলো বাছবেন?

উ আমি নিশ্চই *আতঙ্ক* বাছব, যা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। *হইল চেয়ার* বাছব এবং *গল্প হলেও সত্যি*।

প্র তপনবাবু *গল্প হলেও সত্যি*-তে নিজেকে যেভাবে ছাপিয়ে যেতে পারলেন তখনকার আর গুঁর কোনো ছবিতে সে ব্যাপারটা দেখা যায় না — আপনার কী মত?

উ *গল্প হলেও সত্যি*-তে দুটো খুব interesting জিনিস দেখা যাচ্ছে যে তপনবাবু অনেকদিন পর্যন্ত নব্য ভারতীয় ছবির জগতে সত্যজিৎ, ঋত্বিক, মৃগাল — এঁদের প্রেক্ষিতে কোথাও marginalized। লক্ষ করে দেখবেন যে এই সময়টাতে গুঁর all India recognition-এর জায়গা নতুন করে খুলতে শুরু করেছে। উনি নানারকম কমিটিতে যাচ্ছেন, উনি Children's Film Society তে গেলেন, নানারকম এই জায়গাগুলো হচ্ছে। International festival circuit-এ যাচ্ছেন এই সময়। International festival-এ কলকাতায় পাগলের মতো সমস্ত ছবি দেখছেন। তারপর *গল্প হলেও সত্যি*-তে নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছেন। মানে বড়ো vision, বড়ো philosophy সবসময় illustrate করা যায় না — সেটাকে একটা abstraction-এ নিয়ে যেতে হয় — *গল্প হলেও সত্যি* is



an abstraction, a fantasy. Fantasy is abstraction— realism এর থেকে অনেক দূরে। Realism-কে ছেঁকে তার সারটা নিয়ে কাজ করা।

প্র এবারে একবারে শেষের দিকে এসে কৌতুহলের জন্য একটা প্রশ্ন — উনি ওনার লেখা দুটো বই (মানে পড়ে, *কিছু ছায়া কিছু ছবি*)-তেই কলকাতার কথা, তখনকার চলচ্চিত্র সমাজের কথা প্রচুর লিখছেন, কিন্তু ঋত্বিক ঘটক সম্বন্ধে একটা শব্দও কোথাও নেই, কীভাবে দেখবেন?

উ না, আমি কোনো জবাব দিতে পারব না, ওঁর কী মতামত ছিল আমি জানি না, আমি কোনোভাবেই জানি না, আমি আন্দাজ যেটা করতে পারি যে, Within the trade এবং around the trade দেখার মধ্যে একটা কোথাও পার্থক্য আছে। মানে যাঁরা ঋত্বিকবাবুকে within the trade দেখেছেন, তাঁদের বাধা শুধু ওঁর মদ খাওয়ার জন্য নয়, ঋত্বিকবাবু ওই জায়গাটার মধ্যে অত্যন্ত স্বার্থপর এবং অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন। মানে ঋত্বিকবাবুর একটার পর একটা ছবি করতে যাওয়া— সেটার টাকা পেয়েছেন, তারপরে ছবি শেষ করেননি, ঠকিয়েছেন, অভিনেতাদের পয়সা দেননি। এটা যাঁরা ওই প্রক্রিয়াটার মধ্যে থেকে দেখেছেন—আমি আপনি একটা দূরত্ব থেকে দেখি, কিন্তু যাঁরা দেখেছেন এইসব— দেখেছেন প্রযোজকদের সঙ্গে মারামারি করে ছবি বন্ধ করে দিলেন— *কত অজানারে*— এই ঘটনাগুলো যদি আপনি ওই প্রক্রিয়াটার মধ্যে থেকে দেখেন, বা দেখেন ঋত্বিকবাবু ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাঁর ওপর ছবি করছেন এবং শুনেছি, উনি আক্ষরিক অর্থে রাজভবনে সোফায় উপবিষ্টা ইন্দিরা গান্ধীর পায়ের কাছে বসে, কাঁদুনি গেয়ে ওঁকে রাজি করাচ্ছেন। ঋত্বিক ঘটকের এই আপোষ এই compromises যাঁরা জানতে পারছেন, অথচ শিল্পী হিসেবে দাম দেন, তাঁরা অনেকেই নীরবতার আশ্রয় নেন অন্যদিকে তপনবাবু সারাদিন ওঁর স্টুডিওর ঘরে বসে—খুব সুন্দর বর্ণনা আছে তাঁর লেখায়— trade-



এর সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে, থাকেন। তাঁর সহকারীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক পারস্পরিক নির্ভরতায় বড়োই মানবিক। ক্যামেরাম্যানের প্রসঙ্গে উনি বলছেন এক জায়গায়, সুব্রত মিত্রকে আমি কোনোদিন নিইনি, কারণ এদের সঙ্গে আমার একটা loyalty-র বন্ধন ছিল। এখানে এই যে টিমটার প্রতি বিশ্বস্ততা, এখানে কিন্তু আবার সেই communitarian ব্যাপারটা আসে; সেখানে কিন্তু ঋত্বিক ঘটক একজন সম্পূর্ণ বাইরের লোক, যদি within the trade ব্যাপারটাকে ওইভাবে দেখেন। আমার সেটা মনে হয়, কিন্তু কখনো উনি কোনো অশ্রদ্ধার কথা বা গালাগাল দেওয়ায় যান নি। কারণ সেটা গুঁর ভদ্রতা, গুঁর শোভনতা থেকেই। ছবির হিসাবে তাঁর হয়তো একটা শ্রদ্ধার ভাব আছে কিন্তু he will maintain this, কারণ, Ritwik Ghatak has betrayed the trade, he has betrayed all the people of the trade আমার কোথাও এটাই মনে হয়, কিন্তু আমার সাথে কোনোদিন কোনো কথা হয়নি। *চলচ্চিত্র আজীবন* (দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, ২০০৯) নামে প্রকাশিত তপন সিংহের গদ্যরচনাবলি ও গানের সংগ্রহ সম্পাদনাকালে একটি শিরোনামহীন রচনা পাণ্ডুলিপি রূপে পাই। 'সাহিত্য ও চলচ্চিত্র' নাম দিয়ে সেটি আমি গ্রন্থাস্তর্গত করি। তাতেই ঋত্বিক ঘটকের একমাত্র উল্লেখ পাওয়া যায়—

ছবির গতানুগতিক পোশাক ছেড়ে নতুন ধরনের ছবি নিয়ে আসেন মৃগাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, নিঃসন্দেহে ছবির জগতে নতুন দিগন্ত খুলে দেন। এই দুজনের পথ অনুসরণ করে আজকের কিছু তরুণ পরিচালক ছবি করছেন। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও এই ধরনের কাজ দেখা যাচ্ছে। এঁরা ছবি করার সুযোগ পান একমাত্র সরকার বা সরকার দ্বারা চালিত কোনো সংস্থার সৌজন্যে। দুঃখের কথা কোনো স্বাধীন প্রযোজক এঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করার আগ্রহ বিশেষ দেখান না।



প্র আজ তপন সিংহকে একটা দূরত্ব থেকে দেখে কি মনে হয়?
 উ আমার গুঁর শেষ পর্বটা ভীষণ interesting মনে হয়। আমি একটা লেখা লিখব গুঁর
 সম্বন্ধে, গুঁর ছবিগুলো আরেকবার দেখার পর।
 মানে ওই শেষ দিকের ছবিগুলোতে violence-টাকে ধরে আতঙ্ক বা হইল চেয়ার বা
 অন্তর্ধান এই চার পাঁচটা ছবি নিয়ে।

প্র অনেক ধন্যবাদ।
 উ ধন্যবাদ।

সিল্যুয়েট-এর পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন দেবাজ্ঞান বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভদীপ ঘোষ।

